অন্যরা ছাড়ে আমরা ধরি

মোস্তাফা জব্বার

২০০৮ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণার পর ২০০৯ থেকেই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার ডিজিটাল রূপান্তরের জন্য অনেকগুলো সরকারি উদ্যোগ নেয়া হয়। এসব উদ্যোগের কয়েকটির খবর আমি জানি। ডিজিটাল ক্লাসরুম গড়ে তোলা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও কনটেন্ট তৈরির কাজগুলো নানা সূত্র থেকে শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তরের জন্য করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই নামের একটি প্রকল্প থেকে এই খাতে বিপুল কাজ করা হয়েছে। তাদের কাজের মাঝে ছিল পাওয়ার পয়েন্ট সফটওয়্যারে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষকদের হাতে পাওয়ার পয়েন্টের সহায়তায় শিক্ষার কনটেন্ট প্রস্তুতকরণ। সাবেক শিক্ষা সচিব নজরুল ইসলাম খান গর্ব করে এই ব্যবস্থাকে বলতেন– তিনিই টিচারলেড কনটেন্ট তৈরির একটি ধারণাকে আবিষ্কার করেছেন এবং এটুআইয়ের পরিচালক হিসেবে এটুআইয়ে তার আবিষ্কারের প্রয়োগও করেছেন। আমরা এর গভীরে গিয়ে জেনেছি, টিচারলেড কনটেন্ট অর্থ হচ্ছে শিক্ষকেরা শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান থেকে পাওয়ার পয়েন্টে কনটেন্ট তৈরি করতে শিখেছেন। অভ্র নামে একটি বাংলা সফটওয়্যারের সহায়তায় তারা রোমান হরফে বাংলা লেখা যায় সেটিও শিখেছেন এবং একটি ওয়েব পোর্টালে সেইসব কনটেন্ট জমা রাখছেন, যাতে যেকেউ এসব কনটেন্ট ব্যবহার করতে পারে। এই পোর্টালে এরই মাঝে বিপুল পরিমাণ পাওয়ার পয়েন্ট কনটেন্ট জমাও হয়েছে। সময়ে সময়ে কনটেন্ট তৈরিতে প্রতিযোগিতাও হয়। কাউকে কাউকে পুরস্কার দিয়ে উৎসাহিতও করা হয়। কাজটি চলমান রয়েছে। কিন্তু এখন একটু যাচাই-বাছাই করে দেখার সময় হয়েছে, পাওয়ার পয়েন্ট দিয়ে পড়িয়ে কী ধরনের ডিজিটাল শিক্ষা দেয়া যায়।

আমরা যদি শিক্ষকদের কনটেন্ট তৈরির সফটওয়্যারের ইতিহাসের সন্ধান করি, তবে আমাদেরকে প্রথমেই স্মরণ করতে হবে হাইপার কার্ড নামে একটি সফটওয়্যারের কথা। সেটি ১৯৮৭ সালে প্রথম বাজারজাত করা হয়। ২০০৪ সাল অবধি সেটির একাধিপত্য ছিল। অ্যাপল কমপিউটার ইনক এটি তৈরি করেছিল। ১৯৮৯ সালে সুপার কার্ড নামে আরও একটি সফটওয়্যার তৈরি হয়েছিল স্কুলের কনটেন্ট তৈরির জন্য। তারও আগে উন্নত দুনিয়ায় উপস্থাপনার জন্য ওভারহেড প্রজেক্টর ব্যবহার হতে থাকে। সেইসব প্রজেক্টর ক্লাসরুমেও যায়। হাইপার কার্ড, সুপার কার্ড ও পাওয়ার পয়েন্ট ওভারহেড প্রজেক্টরের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। সেই সূত্র ধরেই শিক্ষায় পাওয়ার পয়েন্টের ব্যবহার দিনে দিনে বাড়ছিল। হাইপার কার্ড ও সুপার কার্ড বেঁচে নেই বলে সেগুলোর ব্যবহার নেই। কিন্তু ইদানিং শিক্ষায় পাওয়ার পয়েন্টের ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আমরা তো সব কিছুতেই পিছিয়ে থাকি বলে এতদিনে আমাদের কর্তারা পাওয়ার পয়েন্ট ধরেছে, যা পশ্চিমারা বহুদিন আগে ছেড়ে দিয়েছে।

বিজনেস ইনসাইডার নামে একটি পত্রিকার অনলাইন সংস্করণে প্রকাশিত এক নিবন্ধে পল রালফ নামে এক নিবন্ধকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পাওয়ার পয়েন্ট সফটওয়্যারটির ব্যবহার নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছেন। ২০১৫ সালের ২৪ জুন প্রকাশিত সেই নিবন্ধে বলা হয়, এটি ছাত্রদেরকে গাধা বানায় এবং শিক্ষকেরা হয়ে ওঠেন বিরক্তিকর। তিনি প্রশ্ন তোলেন, একজন শিক্ষক যখন অনেকগুলো পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড পড়ান তখন কি ছাত্রছাত্রীরা আরও স্মার্ট হয়?

পাশাপাশি তিনি এটিও মনে করেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পাওয়ার পয়েন্ট ব্যবহার করা ছেড়ে দেবে না। কারণ, এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জ্ঞান অর্জনকে গুরুত্ব দেয় না বরং ছাত্রছাত্রীরা কীভাবে খুশি থাকে সেটি ভাবে। এভাবে স্লাইড দিয়ে পড়ানোর ফলে শিক্ষার কি চরম দুর্দশা হয়, সেই বিষয়ে লেখক মন্তব্য করেন, পাওয়ার পয়েন্ট তথা স্লাইডের প্রতি অতিরিক্ত নির্ভরতার জন্য এমন ধারণার জন্ম হয়েছে যে ছাত্রছাত্রীদের বই পড়ার, ক্লাসে আসার, নোট নেয়ার বা বাড়ির কাজ করার যৌক্তিক কারণ নেই। তারা বরং মনে করেন, পাওয়ার পয়েন্ট দিয়ে পড়ালেই ছাত্রছাত্রীরা বই না পড়ে, নিবন্ধ পাঠ না করে বা সমস্যার সমাধান করতে না শিখে দক্ষ ও জ্ঞানী হয়ে যায়। নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়, ওভারহেড প্রজেক্টরের বদলে পাওয়ার পয়েন্ট ছাত্রছাত্রীরা বেশি পছন্দ করলেও এটি তাদের শিক্ষার মান বাড়ায়নি, এমনকি গ্রেডও বাড়ায়নি।

Wikimedia Commons

Liking something doesn't make it effective, and there's nothing to suggest transparencies are especially effective learning tools either.

Research comparing teaching based on slides against other methods such as problem-based learning - where students develop knowledge and skills by confronting realistic, challenging problems - predominantly supports alternative methods.

নিবন্ধে শিক্ষায় পাওয়ার পয়েন্টের ব্যবহারকে নেশার মতো গ্রহণ করার প্রধান আকর্ষণ ও শিক্ষার অন্তরায় হিসেবে তিনটি প্রধান কারণের কথা উল্লেখ করা হয়।

Slides discourage complex thinking. Slides encourage instructors to present complex topics using bullet points, slogans, abstract figures and oversimplified tables with minimal evidence. They discourage deep analysis of complex, ambiguous situations because it is nearly impossible to present a complex, ambiguous situation on a slide. This gives students the illusion of clarity and understanding.

Reading evaluations from students has convinced me that when most courses are based on slides, students come to think of a course *as* a set of slides. Good teachers who present realistic complexity and ambiguity are criticised for being unclear. Teachers who eschew bullet points for graphical slides are criticised for not providing proper notes.

Slides discourage reasonable expectations. When I used PowerPoint, students expected the slides to contain every detail necessary for projects, tests and assignments. Why would anyone waste time reading a book or going to a class when they can get an A by perusing a slide deck at home in their pyjamas?

সূত্র :
http://uk.businessinsider.com/universities-should-ban-powerpoint—it-makes-students-stupid-and-professors-boring-2015-16

এ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থাকে নিবন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একপেশে মূল্যায়ন করাকে দায়ী করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারিভাবে পাওয়ার পয়েন্টভিত্তিক ব্যবস্থাকে শুধু আলিঙ্গন করেনি মাথায় তুলে নিয়েছে। ফলে শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তরকে তারা শুধু পাওয়ার পয়েন্টকেন্দ্রিক করেনি পুরো শিক্ষাব্যবস্থায় একটি চরম ভুল সঙ্কেত দিয়েছে।

পেশাদারি মানের ইন্টারেক্টিভ মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট লাগেই আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যজনক হলো, আমরা ডিজিটাল শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ডিজিটাল কনটেন্ট বিষয়ে সরকারের নীতি-নির্ধারকদের কাউকে কাউকে ভুল ধারণা পোষণ করতে দেখে আসছি। বস্তুত ডিজিটাল পাঠ্য বিষয় নিয়ে নীতি-নির্ধারকদের কেউ কেউ ভাবছেন বহুবিধ ভাবনা। তারা মনে করেন, ইন্টারনেটে এনসিটিবির ই-বই (পিডিএফ ফাইল) থাকলেই পাঠ্য বিষয় ডিজিটাল হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, তারা মনে করেন, এর সাথে শিক্ষকদের দিয়ে কিছু পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন বানালেই সেটি ডিজিটাল পাঠ্য বিষয় হয়ে যায়। কিন্তু আমরা ▸

নিশ্চিতভাবেই জানি, ডিজিটাল কনটেন্ট মানে ই-বুক নয়। বরং বিদ্যমান টেক্সট ও গ্রাফিক্সভিত্তিক কনটেন্টে আমরা খুব সহজেই এতে চলমান লেখা, চলমান ছবি, ইন্টারেক্টিভিটি, ভিডিও এবং প্রোগ্রামিং ক্ষমতা দিতে পারি। ফলে বই হতে পারে ডিজিটাল কনটেন্ট। এনালগ ধারণার বই দিয়ে প্রজেক্টর ও কমপিউটার ব্যবহার করার কোনো মানে দাঁড়ায় না।

আর সেজন্যই আমরা মনে করি, বইকে এরকমভাবে ডিজিটাল পদ্ধতির জন্য রূপান্তর করতে হবে। অন্ততপক্ষে যদি পাঠ্য বিষয়কে সমন্বিতভাবে ইন্টারেক্টিভ মাল্টিমিডিয়া বা চলমান ছবি কিংবা ভিডিওতে রূপান্তর না করা যায়, তবে তাকে আর যাই হোক ডিজিটাল ক্লাসরুম বলা যাবে না। চক-ডাস্টার, খাতা-কলম দিয়ে পড়াশোনা করালে তো প্রজেক্টর আর কমপিউটারের কোনো প্রয়োজন নেই। প্রজেক্টর দিয়ে তো আর কাগজের বই বা ই-বই পড়ানো হবে না। এতে মাল্টিমিডিয়া এবং ইন্টারেক্টিভ কনটেন্ট ব্যবহার করতে হবে। এমনকি এনসিটিবি তাদের বইগুলোকে যে ইন্টারনেটে তুলে দিয়েছে, সেগুলোও কমপিউটারে পড়ানোর কোনো যুক্তি নেই। হতে পারে সেগুলো কমপিউটার থেকে প্রজেক্টর বা মনিটরে দেখানো যেতে পারে। কিন্তু কমপিউটারের বড় সুবিধা হলো এর ইন্টারেক্টিভিটি ও মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করার সুবিধা। এটি খুব স্পষ্ট করে বলা দরকার, ইন্টারেক্টিভ ডিজিটাল কনটেন্ট অর্থ এর মাঝে লেখা থাকবে, শব্দ থাকবে, ভিডিও থাকবে বা অ্যানিমেশন থাকবে। শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা নিজেরা তাদের পছন্দমতো কনটেন্ট বাছাই করতে পারবেন ও সেই কনটেন্টকে তারা নিজে নিজেই ব্যবহার করতে পারবেন। আমাদের অভিজ্ঞতা বলে কাজটি জটিল ও দক্ষতার ওপর নির্ভরশীল।

বস্তুতপক্ষে শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন নিয়ে সারা দুনিয়াতেই ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে। প্রসঙ্গত সাম্প্রতিক একটি খবরের বিষয় উল্লেখ করতে পারি। খবরটি এরকম– NEW YORK — In a radical rethinking of what it means to go to school, states and districts nationwide are launching online public schools that let students from kindergarten to 12th grade take some — or all — of their classes from their bedrooms, living rooms and kitchens. Other states and districts are bringing students into brick-and-mortar schools for instruction that is largely computer-based and self-directed.

Nationwide, an estimated 250,000 students are enrolled in full-time virtual schools, up 40 percent in the last three years, according to Evergreen Education Group, a consulting firm that works with online schools. More than two million pupils take at least one class online, according to the International Association for K-12 Online Learning, a trade group.

Advocates say that online schooling can save states money, offer curricula customized to each student and give parents more choice in education.

Read more:
http://www.foxnews.com/us/2011/11/12/us-public-schools-turn-to-digital-education/#ixzz1hevv1jDt

আমরা যখন ক্লাসরুমকে ডিজিটাল করার লড়াই করার পরিকল্পনা করছি এবং এখনও ছাত্রছাত্রীদের হাতে কমপিউটার দেয়া যায় কি না, ক্লাসরুমের কনটেন্ট এনসিটিবি বানাবে না ক্লাসের টিচারেরা বানাবে, সেইসব নিয়ে বিতর্ক করছি, তখন ক্লাসরুম চলে গেছে বেডরুমে, ড্রইংরুমে বা রান্নাঘরে। আমি মনে করি, ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের এই খবরটি আমাদেরকে হকচকিত করতে পারে। আমাদের জন্য এই ভাবনাটিকে ভিনগ্রহের বা শত বছর পরের বলেও মনে হতে পারে। কিন্তু উটপাখির মতো যতই আমরা বালির নিচে মুখ লুকিয়ে রাখি না কেন, তাতে প্রলয় বন্ধ হবে না।

এ জন্যই এই কথাটি ভুললে চলবে না, এই গ্রহটি ছেড়ে বেঁচে থাকার কোনো পথ এখনও মানুষের জ্ঞানের মাঝে নেই। ফলে এই গ্রহের সাথেই আমাদেরকেও চলতে হবে। আমাদেরকেও একদিন ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের এমন খবর তৈরি করতে হবে।

আমরা মনে করি, শিক্ষার সর্বনিম্ন স্তর থেকে ডিজিটাল প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। এর অর্থ দাঁড়াবে শিশুরা সবার আগে ডিজিটাল শিক্ষা পাবে। তাদের হাতে ডিজিটাল কনটেন্ট ও ডিজিটাল যন্ত্র দিয়ে তাদের শিক্ষার অভিজ্ঞতাকে আনন্দময় করতে হবে। স্কুলের ভীতিকর অবস্থার বদলে শিশুরা স্কুলে হাসতে-খেলতে আসবে– এমন একটি পরিবেশ তৈরি করতে হবে। শিশুদেরকে হালের বলদের মতো কাঁধে শিক্ষার জোয়াল না দিয়ে এমন ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে সে নিজেই ভাবে যে এটি তার প্রয়োজন। ধাপে ধাপে এই ডিজিটাল ব্যবস্থা ওপরের দিকে উঠবে এবং এক সময়ে পুরো শিক্ষাব্যবস্থাটি ডিজিটাল হবে। এই ব্যবস্থা প্রচলনের প্রথম বছরে (ধরা যাক ২০১৬) প্রস্তুতি নিতে হবে। এর পরের বছরে শিশু শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে ডিজিটাল করতে হবে। এ জন্য পাঠ্যপুস্তককে সফটওয়্যারে পরিণত করা, প্রয়োজনীয় ল্যাপটপ/নেটবুক সংগ্রহ ও অবকাঠামো তৈরি করা এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের কাজ করতে হবে। পরবর্তী বছরে তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী, এর পরের বছরে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী এবং তার পরের বছরে নবম-দশম শ্রেণীর শিক্ষাকে ডিজিটাল করতে হবে। দশম শ্রেণীর শিক্ষাকে ডিজিটাল করার পরের বছরে উচ্চ মাধ্যমিক এবং পরবর্তী বছরগুলোতে উচ্চ শিক্ষাকে ডিজিটাল করতে হবে। সার্বিকভাবে ২০২১ সালের মধ্যেই পুরো শিক্ষাব্যবস্থাকে ডিজিটাল করতে হবে। যদি তেমন একটি ইচ্ছে আমাদের থেকেই থাকে, তবে আমাদের দায়িত্ব হবে এর জন্য যথাযথ উপকরণ তৈরি করা।

সরকার ডিজিটাল ক্লাসরুমের জন্য এরকম কনটেন্ট তৈরি করার জন্য কী করেছে, সেটি দেখা যেতে পারে। আমরা জেনেছি, সরকারের ডিজিটাল ক্লাসরুম প্রকল্পের জন্য কনটেন্ট তৈরি করার জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এরই মাঝে অনেক শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়াও হয়েছে। মূলত এই প্রশিক্ষণ মানে হলো শিক্ষকদেরকে পাওয়ার পয়েন্ট অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করতে শেখানো। সরকারের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই মনে করে, পেশাদারি মানের কনটেন্ট প্রয়োজন নেই। বরং শিক্ষকদেরকে কনটেন্ট তৈরি করানো শেখাতে পারলে তারা কনটেন্ট দিয়ে দেশটিকে ভরিয়ে দিতে পারবেন। এটিকে এটুআইয়ের কোনো এক সাবেক কর্মকর্তার আবিষ্কার বলেও চালানো হচ্ছে। এই ধারণা থেকেই সরকার ডিজিটাল ক্লাসরুম তৈরি করার পদক্ষেপ নেয়ার পরও কনটেন্ট তৈরি করার বাস্তব কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। যদি কেউ এই শিক্ষকদের তৈরি করা পাওয়ার পয়েন্টের কনটেন্ট দেখেন, তবে মন খারাপ করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। শিক্ষকেরা যেসব কনটেন্ট তৈরি করছেন, সেগুলো প্রজেক্টরে নিয়ে দেখালে একেবারে খারাপ লাগবে না। শুধু বই পড়ানোর বদলে এসব প্রেজেন্টেশন হয়তো মন্দের ভালো। এর কারণ, ছাত্রছাত্রীরা বইয়ের বদলে পর্দায় বড় কিছু দেখবে। কিন্তু এসব কনটেন্টকে কোনোভাবেই উন্নত মানের ডিজিটাল কনটেন্ট বলা যাবে না।

আমি মনে করি, শিক্ষকদেরকে পাওয়ার পয়েন্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে খুবই ভালো কাজ করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে শিক্ষকেরা মাল্টিমিডিয়া প্রযুক্তি, ইন্টারনেট এবং প্রজেক্টর ও কমপিউটারের সাথে পরিচিত হচ্ছেন। কিন্তু এই শিক্ষকেরাই ক্লাসরুমের পেশাদার কনটেন্ট তৈরি করবেন এমন আশা করাটা অনেক বেশি হয়ে যাবে। আমি নিজে ১৯৮৭ সাল থেকেই শিক্ষাকে ডিজিটাল করার চেষ্টা করছি। ছাত্রছাত্রীদের জন্য মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট তৈরি করছি অনেক দিন ধরে। আমার অভিজ্ঞতা বলে এটি কোনো একজন মানুষের কাজ নয়। মাল্টিমিডিয়া কনটেন্টের জন্য গ্রাফিক্স ডিজাইন দরকার। ছবি আঁকা দরকার। এর জন্য অডিও দরকার। এর জন্য ভিডিও এবং অ্যানিমেশন দরকার। সর্বোপরি এই মিডিয়াগুলোকে ইন্টারেক্টিভ করা দরকার। ইন্টারেক্টিভ করার কাজটি ফ্ল্যাশ বা এইচটিএমএল বা লুয়া বা এই ধরনের কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে করা দরকার। আমি এটি কোনোমতেই মানতে পারি না, একজন চারুকলায় বিশেষজ্ঞ যে পেশাদারি কাজ করবেন, তা একজন শিক্ষক করতে পারবেন। অডিও, ভিডিও ও অ্যানিমেশন তৈরি বা সম্পাদনার কাজটিও পেশাদারদের, শিক্ষকদের নয়। প্রোগ্রামিং করার কাজটি শিক্ষক করতে পারবেন সেই প্রত্যাশাটিও মোটেই আশা করা যায় না। আমি এসব কনটেন্টের জন্য গড়ে তোলা ওয়েবসাইটটি দেখে অবাক হইনি। ওখানে শিক্ষকদের যেসব কনটেন্ট জমা করা আছে, সেগুলোকে কনটেন্ট হয়তো বলা যাবে, কিন্তু পেশাদারি মানের ধারে-কাছেও এসব